অদেখা ১৯৭৪
দুর্ভিক্ষের বাংলাদেশ

হিস্টোরিক্যাল ট্রান্সপ্যারেন্সি সোসাইটি

ঐতিহ্য

ভূমিকা

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের ৫০ বছর ও প্রথম ছবি-সংকলন প্রকাশ

২০২৪ সালটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বছর। কোটা আন্দোলন হতে সূচিত হয়ে ৫ আগস্ট, ২০২৪ শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী বা ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের ইতিহাসে আলোচিত হতে থাকবে বারংবার। পাশাপাশি এই বছরটির আরেকটি তাৎপর্য আছে– ২০২৪ সাল হলো স্বাধীন বাংলাদেশের এযাবৎকালের একমাত্র ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। এটি ছিল এক জাতীয় দুর্যোগ। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই সংঘটিত হয় এই দুর্ভিক্ষ, যা চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। সুদীর্ঘকাল ধরে এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও ব্যপ্তির ইতিহাস ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। তাই একদিকে এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণা যেমন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, তেমনি এই দুর্ভিক্ষভিত্তিক ইতিহাসচর্চাও অপ্রতুল। তদুপরি এই ঘটনাকে 'সামান্য খাদ্যাভাব' হিসেবে উল্লেখ করে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টাও কম করা হয়নি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, লুটপাট ও তারপর বন্যা– সবমিলিয়ে বাংলাদেশে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, খাদ্য ও বস্ত্রাভাব। স্বাভাবিকভাবেই তাই এই চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজনের ঘাটতি আছে। সেই তাগিদ থেকেই আমরা এই উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বইটির কাজ করেছি ও আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পৃথিবীব্যাপী সংঘটিত দুর্ভিক্ষসমূহের মতোই এই দুর্ভিক্ষ ছিল প্রচণ্ডরকম হৃদয়বিদারক। অনেকে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দিনগুলোকে মরণ-যন্ত্রণার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষ খাদ্যাভাবে 'ভুখা মিছিল' করেছে; কচুপাতা সেদ্ধ করে খেয়েছে, হোটেলে ফেলে দেওয়া মাছের কাঁটা ভর্তা করে খেয়েছে। অন্নাভাবে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে, পিতামাতা বিক্রি

করেছেন সন্তানকে। এসব ঘটনা তথ্য আকারে আগে আসলেও, এই দুর্ভিক্ষের ছবিভিত্তিক সংকলন তেমন নেই বললেই চলে। তাই বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এই মর্মস্পর্শী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি সংগ্রহ করতে আমরা সর্বাত্মক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করি। তিন মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই বইয়ের ছবি সংকলন। বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন আর্কাইভ ও সূত্র ব্যবহার করে আমরা এই ছবিগুলো সংগ্রহ করেছি। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। ছবির পাশাপাশি কিছু খবরের কাটিং-ও সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলো আসলে না দিলেই নয়। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে তা একান্ত জরুরি। বইটির শেষাংশে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নিয়ে কিছু প্রচলিত মিথ নিয়েও আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি বইটি প্রকাশে আগ্রহ দেখানোর জন্য খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য-কে ধন্যবাদ।

দেশ ও ইতিহাসের প্রতি দায় থেকেই আমাদের আজকের পথচলা। নতুন প্রজন্মকে দেশের এই অনালোচিত বা স্বল্প আলোচিত ঘটনার ইতিহাস জানতে হবে– এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার কথা উপলব্ধি করতে হবে। তখনকার আওয়ামী লীগ সদস্যদের রিলিফ চুরির কথা জানতে হবে। জানতে হবে কীভাবে অস্বীকার করা হয়েছিল দুর্ভিক্ষের অজস্র মানুষের মৃত্যুর খবরাখবর।

আমরা আশা করি, এই বইটি একদিকে নতুন প্রজন্মের সামনে যেমন চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষকে সচিত্র উপস্থাপন করতে পারবে, তেমনিভাবে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্যও হয়ে উঠবে তথ্য, ছবি ও সূত্রের উৎস। তবেই আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে।

ধন্যবাদান্তে–
সম্পাদক পর্ষদ
হিস্টোরিক্যাল ট্রান্সপ্যারেন্সি সোসাইটি।

পরিচিতি

দেশ স্বাধীনের পর যখন সবাই এই আশা নিয়ে আছে যে মুজিব তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, কে জানত যে তার দুই বছরের মাথায় এমন দুর্ভিক্ষ হবে যা বিশ্ববাসী আগে কখনো দেখেনি। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ শুরু হলেও এটির বীজ বপন হয়েছিল সেই ১৯৭২ সালে।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতা নেয়, সে সময়ে এটি নজরে না আসলেও ধীরে ধীরে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে একে একে সব সত্য। পশ্চিম পাকিস্তান বিগত ২৩ বছরে যে দুর্নীতি করেছিল, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মাত্র ২ বছরেই তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দুর্নীতি করে বলে কেউ কেউ বলেন; ফলাফল যা হওয়ার তাই-ই হয়েছিল– দুর্ভিক্ষ ও অজস্র মানুষের মরণ। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের যখন গুরুদায়িত্ব পেল জাতীয় নেতারা, তখন তারা যতটা না দেশগঠনের কাজ করছিল, তার চেয়ে বেশি তারা মনোনিবেশ করেছিল কীভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা যায়। শেখ মুজিবুর রহমান তার তোষামোদকারী লোকজনদের জায়গা দিয়েছিলেন বঙ্গভবনে, তিনি তাঁর সমালোচনা সহ্যই করতে পারতেন না বরং যারাই তাঁর বিরুদ্ধে আঙুল তুলত তাদের অপদস্থ হওয়া লাগত। এমনটি প্রতীয়মান হয় নানা ঘটনায়, যেমন দেখা গেল ১৯৭৪ সালে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত 'হক কথা' পত্রিকায় ১৯৭৪ সালে সম্পাদকীয়তে লিখেন, "শয়তান প্রধান নিজেও একজন মানুষকে গোমরাহ করতে অনেক কষ্ট করতে হয়। কখনও সফল হন কখনও ব্যর্থ হন। কিন্তু শেখ মুজিব যেভাবে একটি বক্তৃতা দিয়ে তার সকল অনুসারীদের গোমরাহ করেন, সে যোগ্যতা শয়তান প্রধানের নেই। শেখ মুজিব এককথায় যতজন মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারেন, শয়তান প্রধান সারাজীবনেও তা করতে পারেন না।"

আমদানি, রপ্তানি ও বিতরণের প্রতিটি স্তরে স্তরে দুর্নীতি, কালোবাজারি, চোরাচালান, আত্মসাৎ, লুট ইত্যাদির বদৌলতে খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় একপ্রকারের অস্থিরতা দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার মতো সামর্থ্যবান মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না, চালের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। প্রকৃতিও সহায় হলো না, বরং দেশের অর্ধেক অঞ্চলই প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত হলো, যার ফলে বন্যাকবলিত অঞ্চলের মানুষরা নতজানু হয়ে পড়ল মৃত্যুর দূতের সামনে। একে একে অপুষ্টি, অর্ধাহারে, অনাহারে, উপোসে থাকতে থাকতে মানুষ মারা গেল। যারা মারা গেল না তারা জীর্ণশীর্ণ রোগাক্রান্ত দেহ নিয়ে প্রতিদিনের সূর্য দেখত আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়িয়ে অপেক্ষায় থাকত ত্রাণসামগ্রী দাতাদের, কিন্তু দেখা যেত রিলিফ দেওয়ার মতো কেউ তো আসত না। মোটা চালের দাম গত বছরের তুলনায় ২৪০ শতাংশ বেড়েছিল। পাটকল, যা প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস, চার বছর আগের তুলনায় ৪০ শতাংশ কম উৎপাদন করছিল। হাজার হাজার কৃষক খাদ্য কিনতে তাদের হাঁড়িপাতিল, গরু এমনকি জমি বিক্রি করে গ্রামে আশ্রয়হীন অবস্থায় বসবাস করত। অনেকে বাড়ি বিক্রি করে দিত। চালের টিন, আসবাবও।

ঢাকার রাস্তাগুলো ভিক্ষুক নারী এবং নগ্ন শিশুদের দ্বারা পরিপূর্ণ। ক্ষুধার্ত পরিবারগুলো নীরবে বসেছিল। এক নারী তার অনাহারে মৃত্যুবরণ করা মৃত শিশুকে বুকে নিয়ে আমেরিকান দূতাবাস ভবনের সামনে কাঁদছে, এমন ছবিও দেখা যায় সেসময়কার। শেখ মুজিব সরকারিভাবে বললেন যে, ২৭ হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছেন, তবে কমপক্ষে সংখ্যাটি লক্ষের ওপরে বলে কেউ কেউ মনে করেন। কেবল দেশের উত্তরাঞ্চলেই পঞ্চাশ হাজার লোক মারা যায় বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের প্রাণভূমি গোপালগঞ্জ জেলারও অবস্থা ছিল করুণ।

অবস্থা বেগতিক দেখে ও চাপে পড়ে সরকার লংগরখানা তৈরির সিদ্ধান্ত নিল। সব ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে একটি করে লংগরখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। হাজার হাজার মানুষ রাজধানী ঢাকার দিকে ছুটে আসতে শুরু করে যেন দু-মুঠো ভাত খেতে পারে। যাকে তারা বঙ্গবন্ধু মনে করত, সেই বঙ্গবন্ধু তো কিছু করতেই পারলো না বরং তার সরকার উলটো রক্ষীবাহিনীর দ্বারা চালালো নির্যাতনের স্টিমরোলার। ডেমরা ক্যাম্পে সাংবাদিককে দেখে এক ছিন্নমূল বৃদ্ধ বলে ওঠেন, "আমাদেরকে খাইতে দেন, আর না হয় গুলি কইরা মারেন।"

এই দুর্ভিক্ষের সময় বাংলাদেশ এমন কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, যা এযাবৎকালের মধ্যে নজিরবিহীন। রাজধানী ও জেলাশহরগুলোতে তখন হতো ভুখা মিছিল– খাদ্য চেয়ে মানুষ নেমে আসত রাস্তায়, দিত স্লোগান। অনাহারে সন্তান বিক্রি ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে। খাবার না পেয়ে মানুষ আত্মহত্যা করেছে। কেউ কচুপাতা সেদ্ধ করে খেয়েছে। ত্রাণের খাদ্য না পেয়ে মানুষ পচা আটা নিয়ে ফেরত গিয়েছে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ দেখে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য ও ত্রাণ আসতে শুরু করে ও যুদ্ধপরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য যখন রেডক্রস আন্তর্জাতিক রিলিফ পাঠায়; তখন তৎকালীন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা-কে রেডক্রসের বাংলাদেশের প্রতিনিধিমূলক সভাপতি করা হয়, যাকে বলা হতো শেখ মুজিবুর রহমানের ডান হাত। তিনি ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের সময় পাঠানো কয়েক মিলিয়ন সংখ্যক কম্বল লোপাট করে দেন এবং তাকে নিয়ে বিপুল সংখ্যক শিশুখাদ্য চুরির অভিযোগ আছে। ধারণা করা হয়, দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে মানুষরা গড়ে ৭ কৌটা শিশুখাদ্যের মধ্যে ১ কৌটা পায় এবং গড়ে ১৩টি কম্বলের মধ্যে ১টি কম্বল পায়। তৎকালীন আমলে, একজন বাঙালি অর্থনীতিবিদ এক মন্ত্রী সম্পর্কে বলেন, "যুদ্ধের পরে তাকে দুই কার্টন আমদানি করা সিগারেট দিয়ে ঘুষ দেওয়া যেত। এখন এটি কমপক্ষে ১,০০,০০০ টাকা (প্রায় ১২,০০০ মার্কিন ডলার)।"

নজিরবিহীন এমন দুর্নীতি ও ঘুসের ব্যাপার খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছিল তখন। বিশেষজ্ঞদের মতে অনুমান করা হয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পাচার হওয়া চালের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টন থেকে শুরু করে ১০ লাখ টন পর্যন্ত। তখন ৭০ জন বাঙালি অর্থনীতিবিদ, লেখক এবং আইনজীবী, ড. আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে, একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ ছিল মানুষের তৈরি এবং এটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ছেড়ে দেওয়া নীতির সরাসরি ফল, যা লুটপাট, শোষণ, আতঙ্ক, চাটুকারিতা, প্রতারণা এবং কুশাসনে পরিপূর্ণ।"

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন খবর ও সমালোচনা প্রকাশিত হতে শুরু করলে তিনি তার পক্ষের ৪টি সংবাদপত্র ব্যতীত দেশের সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকাও খবর ছাপা শুরু করে, কিন্তু কোনোকিছুতেই কাজ হয় না। হতাশায় জর্জরিত সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও শোনা যায় পাকিস্তানের শাসনের সময় জীবন আরো ভালো ছিল। শেখ মুজিবের সহযোগীরা স্বীকার

করেছিলেন যে তিনি দুর্বল প্রশাসক, তাদের ভাষ্যমতে, "তিনি পছন্দ করেন মানুষ তার পায়ে হাত দিক, তাকে একজন পিতৃতুল্য হিসেবে সম্বোধন করুক, একজন তাকে জানেন এমন বাঙালি বলেন। তার আনুগত্য তার পরিবার এবং আওয়ামী লীগের প্রতি। তিনি বিশ্বাস করেন না যে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।" তার এই অগাধ বিশ্বাসই বোধহয় সরকারের অর্থনৈতিক পতনের মূল কারণ ছিল, তার সাথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তো ছিলই।

১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের মতো শোচনীয় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো পড়েনি। স্বাধীনতার এই তৃতীয় বছরে মানুষের আশা ছিল অন্তত পাকিস্তানি যুগের বৈষম্য ও মূল্যস্ফীতি লাঘব পাবে, কিন্তু এমন দুর্ভিক্ষ কেউ কখনো কল্পনা করতে পারেনি, শেখ মুজিব তার জনতুষ্টিমূলক বক্তব্য দিয়ে মানুষকে আশা জোগাতে পারলেও বাস্তবে সে কিছুই করতে পারেনি, বরং তার প্রশাসন এদেশের মানুষদের ধোঁকাই দিয়েছিল, ফলস্বরূপ মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু যারাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে তাদেরকেই শেখ মুজিবের তৈরিকৃত রক্ষীবাহিনী তুলে নিয়ে যায় এবং সে আর কখনো বাড়ি ফিরতে পারে না। এভাবে ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় হিসেবে ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ লেখা আছে।

এতকাল ধরে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে এর ইতিহাস। ভাবখানা এমন, যে এই দুর্ভিক্ষের মৃত মানুষগুলোকে আমরা চিনিই না। অথচ তারা আমাদের দেশেরই মানুষ, প্রবল খাদ্যাভাব যাদেরকে পরাস্ত করেছিল।

আওয়ামী লীগের অব্যবস্থাপনার এই দুর্ভিক্ষ থেকে আমাদের শিক্ষা এটাই হওয়া উচিত, যেন ভবিষ্যতে আমরা রাষ্ট্রপরিচালনায় সঠিক ব্যবস্থাপক ও নেতৃত্ব নির্বাচন করতে পারি।

শুভেচ্ছান্তে

দুর্ভিক্ষ বললেই সবার আগে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তেতাল্লিশ নিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সেই কালজয়ী চিত্রকর্ম, মন্বন্তর। কিন্তু ইতিহাস বিবেচনায় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল একবার, সেটা চুয়াত্তর সালে। দুঃখের বিষয়, তেতাল্লিশের মন্বন্তর নিয়ে আমাদের কিছুটা জানাশোনা থাকলেও চুয়াত্তরকে সবসময় রাখা হয়েছে পর্দার অন্তরালে! কেননা এই দুর্ভিক্ষ ছিল তথাকথিত 'জাতির পিতা'-র স্বেচ্ছাচারিতা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতির জলজ্যান্ত স্মারক। লক্ষ মানুষের ক্ষুধার্ত, অতৃপ্ত, বিদেহী আত্মার সাক্ষী এই দুর্ভিক্ষ। তাই এর প্রকৃত ইতিহাস উন্মোচন অত্যন্ত জরুরি এবং সময়োপযোগী। তবে শুধু চুয়াত্তর নয়, একাত্তর তথা স্বাধীন বাংলাদেশ সময়কাল থেকে যে পরিমাণ মিথ্যে ও পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস আমাদের সামনে উপস্থাপন করে একটি প্রজন্মকে ভুল পথে পরিচালিত করার প্রয়াস দেখা গিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে হতাশাব্যঞ্জক। অতএব, ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় স্বচ্ছতা এবং সততা আনয়নের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের নিকট সে দায়মুক্তি অত্যন্ত জরুরি।

এস এম তানিম
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

সূচিপত্র

ইত্তেফাক ১৭
গণকণ্ঠ ৩৩
দৈনিক সংবাদ **উৎৎড়ৎ! ইড়ড়শসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ.**
পূর্বদেশ ১১৬
দৈনিক বাংলা ১৪৭
আরো সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য ছবি ১৭১
চুয়াত্তর নিয়ে কিছু দুর্লভ কার্টুন ১৮৩
দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটি মিথের গবেষণা : আসলেই কি দুর্ভিক্ষের সময় সোনার মুকুট দিয়ে শেখ কামালের বিয়ে হয়েছিল? ১৮৮

ইত্তেফাক

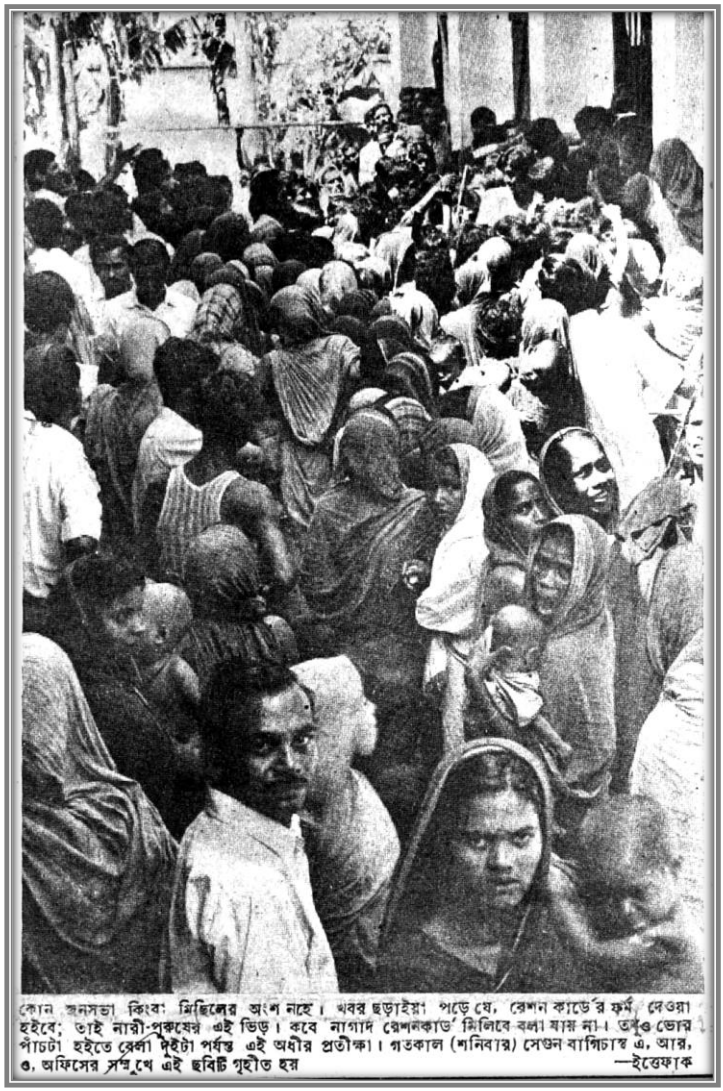

কোন জনসভা কিংবা মিছিলের অংশ নহে। খবর ছড়াইয়া পড়ে যে, রেশন কার্ডের ফর্ম দেওয়া হইবে; তাই নারী-পুরুষের এই ভিড়। কবে নাগাদ রেশনকার্ড মিলিবে বলা যায় না। তবুও ভোর পাঁচটা হইতে বেলা দুইটা পর্যন্ত এই অধীর প্রতীক্ষা। গতকাল (শনিবার) সেগুন বাগিচাস্থ এ, আর, ও, অফিসের সম্মুখে এই ছবিটি গৃহীত হয় —ইত্তেফাক

ছবি-১ : ২৪ মার্চ, ১৯৭৪

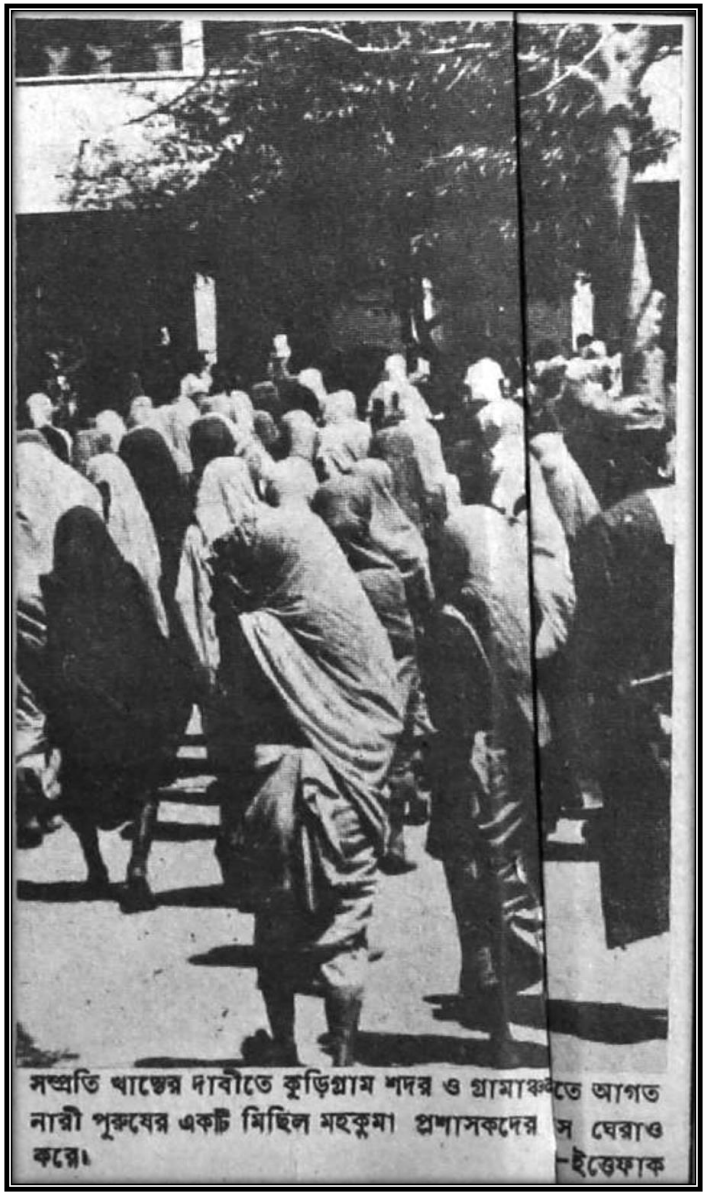

ছবি-২: ৬ এপ্রিল, ১৯৭৪

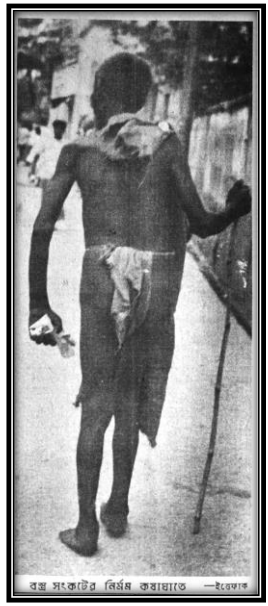

ছবি-৩: ১৫ মে, ১৯৭৪

ছবি-৪: ১০ জুলাই, ১৯৭৪

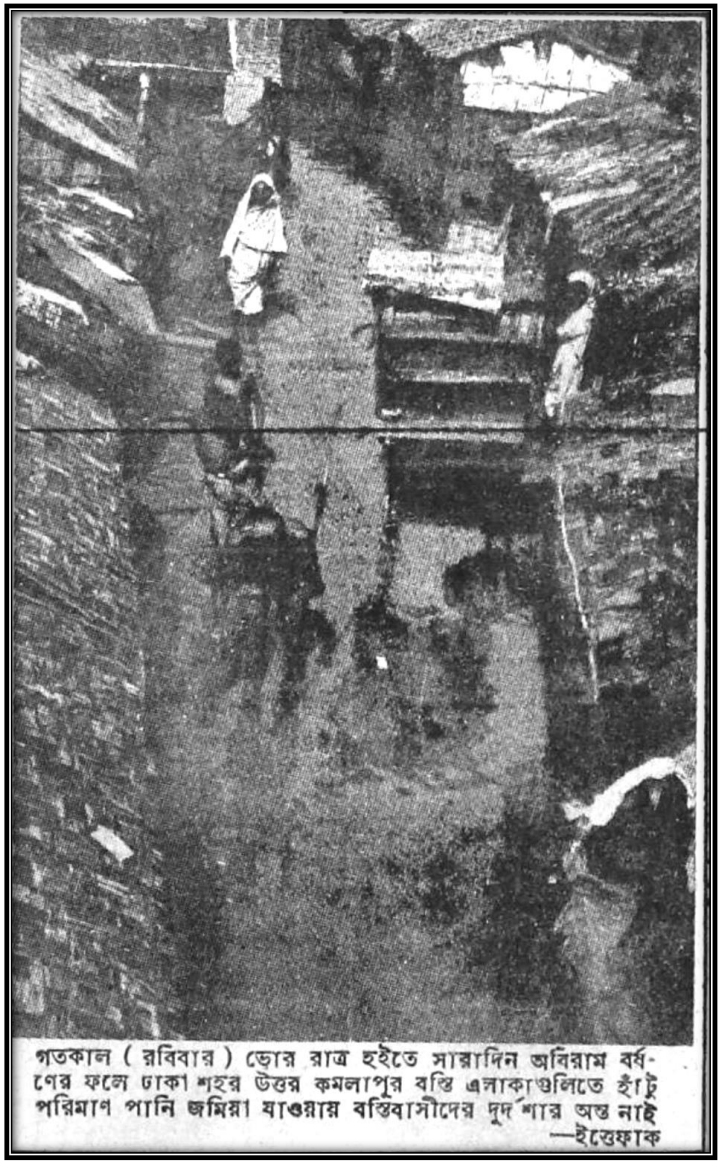

গতকাল (রবিবার) ভোর রাত্র হইতে সারাদিন অবিরাম বর্ষণের ফলে ঢাকা শহর উত্তর কমলাপুর বস্তি এলাকাগুলিতে হাঁটু পরিমাণ পানি জমিয়া যাওয়ায় বস্তিবাসীদের দুর্দশার অন্ত নাই
—ইত্তেফাক

ছবি-৫: ১৫ জুলাই, ১৯৭৪

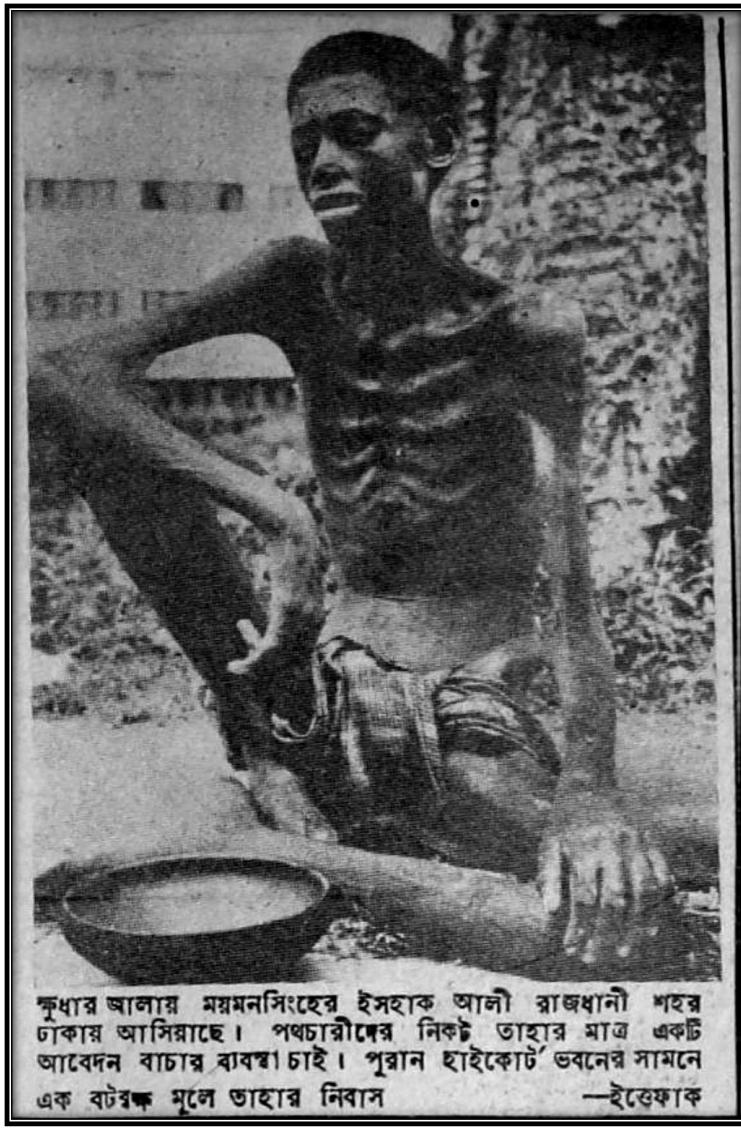

ক্ষুধার জ্বালায় ময়মনসিংহের ইসহাক আলী রাজধানী শহর ঢাকায় আসিয়াছে। পথচারীদের নিকট তাহার মাত্র একটি আবেদন বাচার ব্যবস্থা চাই। পুরান হাইকোর্ট ভবনের সামনে এক বটবৃক্ষ মূলে তাহার নিবাস —ইত্তেফাক

ছবি-৬: ১৫ জুলাই, ১৯৭৪

লজ্জা তাহাকে অবগুণ্ঠনবতী করিতে পারে নাই—জঠর তাহাকে ঘরের বাহিরে আনিয়াছে। লজ্জানম্র মুখ ঢাকিয়া পরের খাবার বহনের জন্য এই পল্লীবালাকে প্রতিদিন বাহির হইতে হয়। —ইত্তেফাক

ছবি-৭: ১৮ জুলাই ১৯৭৪

গোচারণ ক্ষেত্রে নহে, বন্যাকবলিত বাসাবোর একটি পাকাবাড়ীর ছাদের তৃণগুল্মরাজি ভক্ষণরত তিনটি ধেনু —ইত্তেফাক

ছবি-৮: ১৭ আগস্ট ১৯৭৪

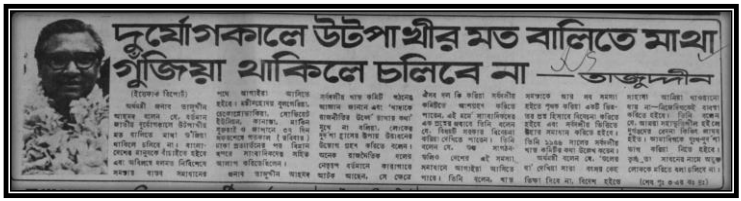

দুর্যোগকালে উটপাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজিয়া থাকিলে চলিবে না —তাজুদ্দীন

ছবি-৯: ১৪ অক্টোবর ১৯৭৪

খাদ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব আবদুল মোমেন গতকাল (রবিবার) মীরপুর লঙ্গরখানা পরিদর্শন করেন। ছবিতে লঙ্গর-খানায় রুটি তৈরী করিতে দেখা যাইতেছে

ছবি-১০: ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৪

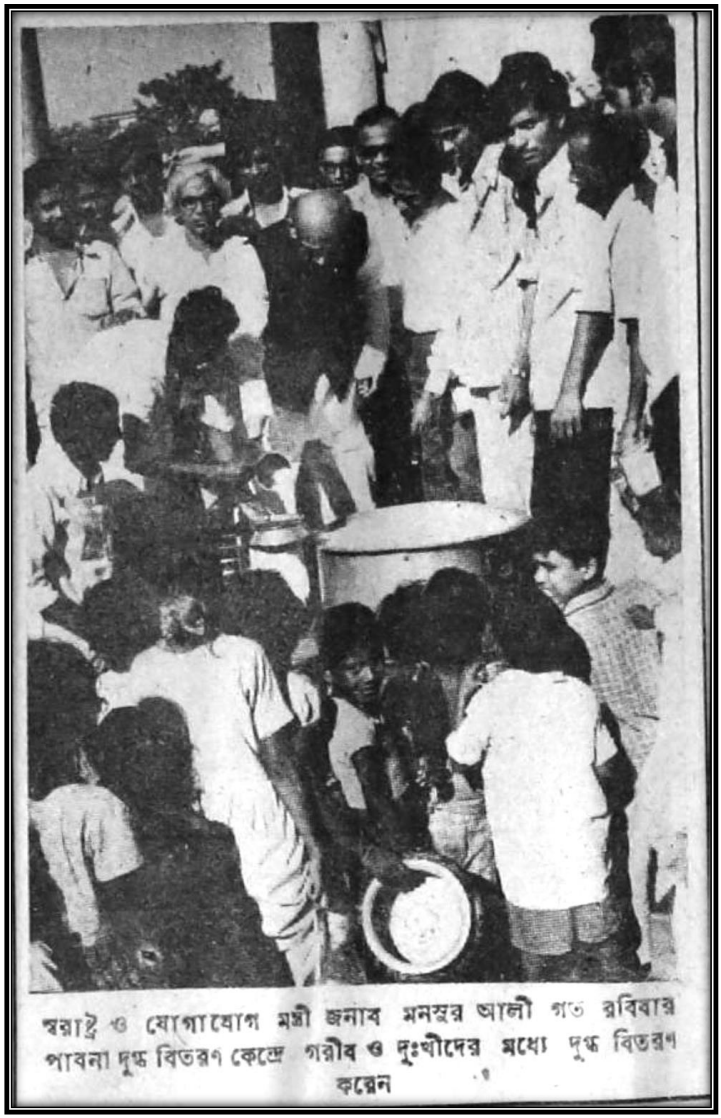

স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী গত রবিবার পাবনা দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রে গরীব ও দুঃখীদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করেন

ছবি-১১: ৫ নভেম্বর ১৯৭৪

বাজারে ফুলকপি উঠিয়াছে। প্রতিটির দাম মাত্র ৬ হইতে ৮ টাকা
—ইত্তেফাক

ছবি-১২: ৯ নভেম্বর ১৯৭৪